

আর-রাহীকুল মাখতুম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ (غَزْوَةُ فَتْحِ مَكَّةَ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

বিভিন্ন অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ (السَّرَايَا وَالْبُعُوثُ):

১. মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজকর্ম সুসম্পন্ন করার পর যখন তিনি কিছুটা অবকাশ লাভ করলেন তখন ৮ম হিজরীর ২৫ রমযান উযযা নামক দেব মূর্তি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। উযযা মূর্তির মন্দিরটি ছিল নাখলা নামক স্থানে। এটি ভেঙ্গে ফেলে খালিদ (রাঃ) প্রত্যাবর্তন করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, (هَلْ رَأَيْتَ شَيْئًا؟) ‘তুমি কি কিছু দেখেছিলে?’ খালিদ (রাঃ) বললেন, ‘না’ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهَا (‘তাহলে প্রকৃতপক্ষে তুমি তা ভাঙ্গ নি। পুনরায় যাও এবং তা ভেঙ্গে দাও।’ উত্তেজিত খালিদ (রাঃ) কোষমুক্ত তরবারি হস্তে পুনরায় সেখানে গমন করলেন। এবারে বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত চুলবিশিষ্ট এক মহিলা তাঁদের দিকে বের হয়ে এল। মন্দির প্রহরী তাকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। কিন্তু এমন সময় খালিদ (রাঃ) তরবারি দ্বারা তাকে এতই জোরে আঘাত করলেন যে, তার দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনি এ সংবাদ অবগত করালে তিনি বললেন, (وَقَدْ أُيسِّرَتْ أَنْ تَعْبُدَ فِي بِلَادِكُمْ أَبَدًا) ‘হ্যাঁ’, সেটাই ছিল উযযা। এখন তোমাদের দেশে তার পূজা অর্চনার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে পড়েছে (অর্থাৎ কোন দিন তার আর পূজা অর্চনা হবে না)।

২. এরপর নাবী কারীম (ﷺ) সে মাসেই ‘আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে ‘সুওয়া’ নামক দেবমূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন। এ মূর্তিটি ছিল মক্কা হতে তিন মাইল দূরত্বে ‘রিহাত’ নামক স্থানে বনু হুযাইলের একটি দেবমূর্তি। ‘আমর যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেন তখন প্রহরী জিজ্ঞেস করল, ‘তোমরা কী চাও?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর নাবী (ﷺ) এ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।’

সে বলল, ‘তোমরা এ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না।’

‘আমর (রাঃ) বললেন, ‘কেন?’

সে বলল, ‘প্রাকৃতিক নিয়মেই তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হবে।’

‘আমর (রাঃ) বললেন, ‘তোমরা এখনও বাতিলের উপর রয়েছ? তোমাদের উপর দুঃখ, এই মূর্তিটি কি দেখে কিংবা শোনে?’

অতঃপর মূর্তিটির নিকট গিয়ে তিনি তা ভেঙ্গে ফেললেন এবং সঙ্গীসাথীদের নির্দেশ প্রদান করলেন ধন ভান্ডার গৃহটি ভেঙ্গে ফেলতে। কিন্তু ধন-ভান্ডার থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি প্রহরীকে বললেন, ‘বল, কেমন হল?’

সে বলল, ‘আল্লাহর দীন ইসলাম আমি গ্রহণ করলাম।’

৩. এ মাসেই সা'দ বিন যায়দ আশহালী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে বিশ জন ঘোড়সওয়ার সৈন্য প্রেরণ করেন মানাত দেবমূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। কুদাইদের নিকট মুশাল্লাল নামক স্থানে আওস, খায়রাজ, গাসসান এবং অন্যান্য গোত্রের উপাস্য ছিল এ 'মানত' মূর্তি। সা'দ (রাঃ)-এর বাহিনী যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেন তখন মন্দিরের প্রহরী বলল, 'তোমরা কী চাও?'

তাঁরা বললেন, 'মানাত দেবমূর্তি ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি।'

সে বলল, 'তোমরা জান এবং তোমাদের কার্য জানে।'

সা'দ মানাত মূর্তির দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে একজন উলঙ্গ কালো ও বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেলেন। সে আপন বক্ষদেশ চাপড়াতে চাপড়াতে হায়! রব উচ্চারণ করছিল।

প্রহরী তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মানাত! তুমি এ অবস্থার ধ্বংস কর।'

কিন্তু এমন সময় সা'দ তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর মূর্তিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিলেন। ধন-ভান্ডারে ধন-দৌলত কিছুই পাওয়া যায় নি।

৪. উযযা নামক দেবমূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার পর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) প্রত্যাভর্তন করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ৮ম হিজরী শাওয়াল মাসেই বনু জায়ামাহ গোত্রের নিকট তাঁকে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণ না করে ইসলাম প্রচার। খালিদ (রাঃ) মুহাজির, আনসার এবং বনু সুলাইম গোত্রের সাড়ে তিনশ লোকজনসহ বনু জায়ামাহর নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তারা (ইসলাম গ্রহণ করেছি) বলার পরিবর্তে (আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছি, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছি) বলল। এ কারণে খালিদ (রাঃ) তাদের হত্যা এবং বন্দী করতে আদেশ দিলেন। তিনি সঙ্গী সাথীদের এক একজনের হস্তে এক এক জন বন্দীকে সমর্পণ করলেন। অতঃপর এ বলে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিকটে সমর্পিত বন্দীকে হত্যা করবে। কিন্তু ইবনু উমার এবং তাঁর সঙ্গীগণ এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর যখন নাবী কারীম (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি দু' হাত উত্তোলন করে দু'বার বললেন, **اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدًا** 'হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তা হতে তোমার নিকটে নিজেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি।'[1]

এ পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র বনু সুলাইম গোত্রের লোকজনই নিজ বন্দীদের হত্যা করেছিল। আনসার ও মহাজিরীনগণ হত্যা করেননি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করে তাদের নিহত ব্যক্তিদের শোণিত খেসারত এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে খালিদ (রাঃ) ও আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-এর মাঝে কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এবং সম্পর্কের অবগতি হয়েছিল। এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন,

مَهْلًا يَا خَالِدُ، دَعْ عَنْكَ أَصْحَابِي، فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا أَدْرَكْتُ غُدُوَّةَ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِي وَلَا رَوْحَتَهُ

'খালিদ থেমে যাও, আমার সহচরদের কিছু বলা হতে বিরত থাক। আল্লাহর কসম! যদি উহুদ পাহাড় সোনা হয়ে যায় এবং তার সমস্তই তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করে দাও তবুও আমার সাহাবাদের মধ্য হতে কোন এক জনেরও এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যার ইবাদতের নেকী অর্জন করতে পারবে না।'[2]

মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত মীমাংসাকারী যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ই ছিল প্রকৃত বিজয় যা মুশরিকদের শক্তিমত্তা ও অহংকারকে এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল যে, আরব উপদ্বীপে শিরক বা মূর্তিপূজার আর কোন অবকাশ ছিল না। কারণ, মুসলিম ও মুশরিক এ উভয় পক্ষ বহির্ভূত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে ব্যাপারটি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল যে, মুসলিম ও মুশরিকদের সংঘাতের পরিণতিটা কী রূপ নেয়। সাধারণ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ এটা ভাল ভাবেই অবগত ছিল যে, যে শক্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেবলমাত্র সে শক্তিই হারামের উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। তাদের বিশ্বাসকে অধিক বলীয়ান করেছিল অর্ধশতাব্দী পূর্বে সংঘটিত আবরাহ ও তার হস্তী বাহিনীর ঘটনা। আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান হস্তীবাহিনী কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তা তৎকালীন আরবাসীগণ সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছিল।

প্রকাশ থাকে যে, হুদায়বিয়াহর সন্ধিচুক্তি ছিল এ বিরাট বিজয়ের চাবি কাঠি। এ সন্ধি চুক্তির ফলেই শান্তি ও নিরাপত্তার পথ প্রশস্ত হয়েছিল, মানুষ প্রকাশ্যে একে অন্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এবং ইসলাম সম্পর্কে মত বিনিময় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মক্কায যাঁরা গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এ চুক্তির ফলে তাঁরা স্বীয় ধীন সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথাবার্তা বলা ও প্রচারের সুযোগ লাভ করেন, এ চুক্তির ফলে শান্তি ও নিরাপত্তার একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়ার ফলে বহু লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর ফলে ইসলামী সৈন্যের সংখ্যাও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। ইতোপূর্বে যেক্ষেত্রে কোন যুদ্ধেই তিন হাজারের বেশী মুসলিম সৈন্যের সমাবেশ সম্ভব হয় নি, সেক্ষেত্রে মক্কা বিজয়ের অভিযানে দশ হাজার মুসলিম সৈন্য অংশ গ্রহণ করেন।

এ মীমাংসাকারী যুদ্ধ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্ট পর্দা উন্মোচিত করে দিয়েছিল যা ইসলাম গ্রহণের পথে ছিল একটি বিরাট অন্তরায়স্বরূপ। এ বিজয়ের পর সমগ্র আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গগণ প্রদীপ্ত সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মক্কা বিজয়ের পর ধর্মীয় ও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব মুসলিমগণের হাতে এসে গিয়েছিল।

হুদায়বিয়াহর সন্ধি চুক্তির পর মুসলিমগণের অনুকূলে পরিবর্তনের যে সহায়ক ধারা সূচিত হয়েছিল, মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে। অধিকন্তু, এ বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপে মুসলিমগণের অধিকার ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যার ফলে আরবের গোত্রসমূহের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা রইল যে, তারা বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধির আকারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের দাওয়াত কবুল করবে এবং ইসলামের বিস্তৃতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়বে। এ মর্মে তাদের প্রস্তুতিপর্ব পরবর্তী দু' বছরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৪৫০ পৃষ্ঠা, ২য় খন্ড ৬২২ পৃষ্ঠা।

[2] এ যুদ্ধ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত উৎস সমূহ থেকে নেয়া হয়েছে। ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ২৮৯-৪৩৭ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড জিহাদ পর্ব এবং হজ্জ ২য় খন্ড ৬১২-৬২৫ পৃঃ, ফাতহুল বারী ৮ম খন্ড ৩-২৭ পৃঃ, সহীহুল মুসলিম ১ম খন্ড ৪৩৭-৪৩৯ পৃঃ, ২য় খন্ড ১০২, ১০৩, ১৩০ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ২য় খন্ড ১৬০-১৬৮ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মুখতাসারুস সীরাহ ৩২২-৩৫১ পৃঃ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6401>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন